আমি এখনো জন্মাইনি

লুবনা চর্যা

কবিতাক্রম

১. স্নিগ্ধ হাসির সাথে দেখা করে আসি
২. বিকল্পই অবিকল্প হয়ে ওঠে
৩. মনের ধুলো
৪. উৎকর্ষতার পাহাড়
৫. হাছন রাজার গান
৬. ওরা স্বর্গে যাবে
৭. বালিশে কান পেতে ঝড়ের শব্দ শুনতে হয়
৮. একের পর এক গন্তব্যের নিশানা আর নিস্পৃহ ক্লান্তি
৯. হাঁসফাঁস পাতাল
১০. ভবিষ্যতের ডাইনোসর
১১. ছাতিম ও অন্যান্য
১২. অন্ধ তারা
১৩. অপরূপ ডানাগুলো
১৪. চেইন অর উইংস অফ আফিম
১৫. কুৎসার উঁইঢিবি
১৬. শূন্য
১৭. ভাগ ভাগ বিভাগ বিভাগ
১৮. শান্তি নামের ছেলেটা
১৯. বনে ফিরে যাই

২০. নামহীন শ্রমিকের গান
২১. না জন্মানো শিশুর গান
২২. দায়মুক্ত স্বাধীনতার বিষ
২৩. আধুনিক চাকর
২৪. রাস্তার পাগলের গান
২৫. বন্ধু
২৬. সাময়িক অবসর
২৭. টাকার ফেরেশতা
২৮. ভূত
২৯. তেলাপোকা
৩০. ঝাপসা বোমা
৩১. কেউ আমারে দত্তক ন্যাও, আমি আবার আন্ডাকালে ফিরা যাইতে চাই
৩২. সাক্ষাৎকার
৩৩. শিরোনামহীন
৩৪. জিন্দা মরহুমের এপিটাফ
৩৫. আশাবাদী
৩৬. শিকারি
৩৭. হাওয়া, হাওয়া
৩৮. রোবট বধের ইতিকথা
৩৯. অন্ধকারে উধাও ও আমার বোবা গায়ক নদী
৪০. অসীম কাল ধরে অকালপুরুষ চোখ বুজে করে যায় শিকার
৪১. পুনর্জন্ম
৪২. শিয়াল ও মুরগি
৪৩. তারা ভরা দিগন্তের দিকে
৪৪. অচল নাট্যশালা
৪৫. অন্যরূপে

৪৬. মানবজন্ম

৪৭. আরবান সেক্সুয়াল ক্রাইসিস বা এন্টারটেইনমেন্ট

৪৮. প্লেটোনিক প্রেম

৪৯. শিউলি ফুলের গন্ধ

৫০. চলো এগিয়ে যাই

৫১. শেষ থেকেই শুরু করি

৫২. আজকাল যা কিছু মিস করি অথবা পারফেকশনিস্ট মানব ওরফে রোবট সম্প্রদায়

৫৩. যাব সাধুর চরণ খুঁজে

৫৪. মুমূর্ষুর রাষ্ট্রে

স্নিগ্ধ হাসির সাথে দেখা করে আসি

কিছু কান্না জমিয়ে রাখি, যাতে আস্তে ধীরে
সময় নিয়ে পরে কাঁদা যায়। মানুষ যেমন একটু একটু
করে টাকা জমায়, তারপর দূরে কোথাও বেড়াতে যায়
তেমন করে আমি কান্নাগুলোকে জমিয়ে রাখি।
যেদিন হয়তো সময় করতে পারব কান্নাগুলোকে কাঁদার,
সেদিন মর্সিয়া হবে, কারবালা নামবে পৃথিবীতে
আর আমি সবাইকে পান করতে দেবো ইক্ষুরসের মতো এক গ্লাস
নিরেট অশ্রু। এটা সেটা ঝামেলায় কান্নাগুলোকে
আমি বারবারই উপেক্ষা করি, বলি পরে আসতে।
যেমন ফিরে যায় বিমুখ ভিখারি। আর আমি
সৎ মায়ের মতো তঞ্চকতা করে ভালোবাসি নিজের
আনন্দ সন্তানগুলোকে। অবিরাম কান্নার সেই ক্ষণ
শুধু পেছাতে থাকে যেমন পেছাতে থাকে
সরকারি অফিসের কাজ। এমন করে তাকে ফাঁকি দিয়ে
আমি কি গোপনে গোপনে চলে যাচ্ছি মৃত্যুর
সদরগেটের দিকে? একটা জীবন দীর্ঘ স্বপন
পার করে ফেলব কান্নাকে এড়িয়ে চলে?
বাইরে চড়ুই পাখি ডাকছে চড়ুইভাতিতে, বৃষ্টি না হলেও
এই শীতে কুয়াশারা জল দেয় গাছে। প্রবল একটা কান্না
ঘূর্ণিপাক খেতে থাকে মস্তিষ্কের সবুজাভ আকাশে
আর আমি তাকে বলি: পাঁচটা মিনিট সময় দাও,
একটু স্নিগ্ধ হাসির সাথে দেখা করে আসি...

বিকল্পই অবিকল্প হয়ে ওঠে

যা কিছু চাই, তা পাই না। অন্য কিছু পাই।
যাকে পাই, তাকে চাই না। অন্য কাউকে হারাই।
অন্য কারো হাতে চকমকি পাথর ঘষে হৃদয়ের অরণ্যে
শীতের আগুন জ্বালাই। যে পথে হাঁটতে চাই
সে পথে অনেক জ্যাম, তাই রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে হাঁটি।
যেভাবে বাঁচতে চাই, সেভাবে না বেঁচে অন্যের
ভালো মন্দের মাপকাঠিতে বাঁচি। যে কথা বলতে চাই,
সে কথা না বলে অন্য সব আবোল-তাবোল বকি।
দ্রোহের জায়গায় প্রেমের কথা বলি। প্রেমের জায়গায়
অবদমনের কথা বলি। ফলে নিজের ছায়ায় লুকিয়ে
থাকে অতৃপ্তি। আকাশের দিকে হাত বাড়ালে
হাত ঠেকে যায় খাঁচায়। ঝামেলামুক্ত থাকব ভেবে
আরো বেশি জড়িয়ে পড়ি ঝামেলায়। প্রত্যাশার দাসত্ব
করতে করতে উৎপাদন করি হতাশা। যা যেভাবে
করব ভাবি তা করি হয়তো ভিন্নভাবে। যা কিছু চাই,
তা পাই না। অন্য কিছু পাই। যাকে পাই, তাকে চাই না।
অন্য কাউকে হারাই। বিকল্পকে বিয়ে করে বিকল্প জীবন
কাটাই। সময়ের সাথে আর দেখা হয় না। বিকল্প সময়ই
আমাকে মহাকাল জুড়ে দৌড়ের ওপরে রাখে। সূর্যের দিকে
তাকালে চোখ ঝলসে যাবে বলে তাকাই বিকল্প চোখে।
চাওয়া পাওয়ার ঝগড়ায় বিকল্পই শুধু অবিকল্প হয়ে ওঠে।

মনের ধুলো

শীতে জানলা খোলা দায়। হুড়মুড় করে সন্ত্রাসীর মতো ঘরে ঢুকে পড়ে ধুলা। ধুলাদের চোখে আমি কালো সানগ্লাস দেখতে পাই। কালো সানগ্লাস, কালো পোশাক পরে তারা পিস্তল তাক করে থাকে। যদিও তাদের পিস্তলকে ভয় লাগে না মোটে, বরং অনেক কিউট মনে হয়। পক্ষান্তরে আমিই ধুলা থেকে বাঁচতে চোখে পরি কালো চশমা। তারপর এইসব নিরেট ধুলোর দিনে স্মৃতিচারণ করি বর্ষা ঋতুর, যখন ধুলা গলে জল হয়ে ভেসে যায় কৃষকের খেত-খামারে। মনের মধ্যেও কিছু ধুলার আনাগোনা, তারাও সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়তে চায় সন্ত্রাসীর মতো। তাদেরকেও দমিয়ে রাখি জানালা বন্ধ করে।

শুধু তখনই এ জানালা খোলা হবে, যখন বৃষ্টির ছদ্মবেশে তাজা জুঁইফুলের মতো ঝরবে আকাশের আনন্দাশ্রু।

উৎকর্ষতার পাহাড়

প্রিয় আয়না, বলো আমি আর কত উৎকর্ষ হব?
উৎকর্ষতা জমাতে জমাতে হব কি
উৎকর্ষতার পাহাড়? কি লাভ বলো সেই পাহাড়
ট্রেকিং করতে যদি না আসে কোনো বিস্মিত আগন্তুক?
কিংবা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী বা কোনো মিষ্টি
হাঁসের পরিবার? উৎকর্ষতার পাহাড়ের ভাঁজে
তারা ডিম পাড়বে, বাচ্চা ফুটবে, ছোটো ছোটো লাল ঠোঁটে
পাহাড়ি লতাপাতা তারা ছিঁড়ে খাবে কিংবা আকাশের
মতো নীল সরোবরে সাঁতার কাটবে জীবনের
চড়াই উৎরাই ভুলে গিয়ে। পুষ্প আপনার জন্য ফোটে
নাকি ফোটে না, এটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাই আজকাল।
দুইটাই তো ঠিক, তবে পাশে কোনো বিস্মিত আগন্তুক
না থাকলে উৎকর্ষতার পাহাড়েরও মন খারাপ লাগতে পারে।
আকাশে বাতাসে যদিও একটাই শ্লোগান: উৎকর্ষতা!
যে গাছের ফল ঝরে যায় প্রথম বছর, পরের বছর
তার ডাল ঝুলে পড়ে ফলের ভারে। প্রকৃতির সব চেহারায়
গ্রাফিতির মতো করে আঁকা 'উৎকর্ষতা'। হাঁটতে গিয়ে
রাস্তায় দেখি চক দিয়ে বড়ো করে কেউ লিখে রেখেছে:
উৎকর্ষতা। ডানে বামে সামনে পেছনে যারা ছুটছে
নীরব যুদ্ধক্ষেত্রে বা ফুল কাননে, জার্সির পেছনে নাম
লেখার মতো তাদের সবার পিঠে লেখা: উৎকর্ষতা!
উৎকর্ষতা অবশ্যম্ভাবী, কোনো মুগ্ধ আগন্তুক
সেই উৎকর্ষতার পাহাড়ে বেড়াতে আসুক বা না আসুক।

হাছন রাজার গান

কিছু কিছু দিন হাছন রাজার গান শুনে
কাটিয়ে দেয়াই ভালো। অনেক আধুনিক মানুষের
ভিড়ে যেন এক বায়বীয় বৃদ্ধ গায়ক একতারা বাজিয়ে
গেয়ে চলে গান না, গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া
হরিণের মতো ধরে আনে মনের কথা।
পাশের বন্ধুটির শেকড়ে কুঠারের আঘাত হানার দিনে
সুর করে পড়ি বনায়নের মন্ত্র। যত কারচুপি
ফেলে দিয়ে ডাস্টবিনে কুড়িয়ে আনি ডানার পালক,
পিঠেরও অলঙ্কার দরকার বলে। চাঁদের দিকে বাড়িয়ে
দিই মই, চাঁদে যাব না—চাঁদকেই বলব মই বেয়ে
নেমে আসতে। সৌন্দর্যের ধারণা ছিল না বলে
অন্ধ কিশোরী সারা মুখে মেখেছিল জ্যোৎস্নার
ফেসপ্যাক। আর আমি বিরহ ভুলতে এক
প্রবীণ বায়বীয় গায়ককে হাত ধরে নিয়ে আসি
জোছনাগলা মেঠোপথ থেকে আমার অমাবস্যার ঘরে।
বলি, আজ সারা রাত আপনার গান শুনব।
“ভাবতে ভাবতে হাছন রাজা হইল এমন আউলা” শুনব।

ওরা স্বর্গে যাবে

ওরা স্বর্গে যাবে তাই চোখ থেকে ভেঙে যাওয়া
চশমার মতো খুলে রাখল স্বপ্নগুলো।
স্বর্গে যাবে, স্বর্গে যাবে করতে করতে বকুলতলার পথ ছেড়ে
গিয়ে পড়ল ম্যানহোলে। স্বর্গে গিয়ে গ্লাসে গ্লাসে
শরাব খাবে বলে পৃথিবীর বৃষ্টিজল নেচে নেচে
ঝরে গেল উঠোনে, তবু তারা একগুঁয়ের মতো
তৃষ্ণা নিয়ে ঠায় বসে থাকল। শত শত অপ্সরীর
কোমর জড়াবে বলে প্রেমিকাকে করল না উষ্ণ আলিঙ্গন
যে আলিঙ্গন দরকার ছিল তাদের দু'জনেরই।
কৃষক আর তার সবুজ শস্যের যেমন দরকার হয়
অকূল বর্ষণ। কিন্তু তা না করে সে নিজেই একটা খরা হয়ে
ঘুরে বেড়াতে লাগল আনন্দ-প্রেম-বিস্ময়হীন এক
নিষ্প্রাণ কাঁটার বাগানে—যে বাগানের মালী রক্তাক্ত হয়ে
বহুকাল আগেই মরে গেছে ঈশ্বরের রক্তশূন্য দেহের ছায়ায়।
আর একটা গান গাওয়া পাখি তার শবদেহ পাহারা
দিতে দিতে পাথর হয়ে পড়ে আছে বাগানের একপাশে।
ওরা স্বর্গে যাবে বলে অন্ধের ছড়ি হাতে দলে দলে
বেরিয়ে পড়েছে শুকিয়ে যাওয়া সমুদ্রের তীর ধরে
জীবনকে লাথি মেরে, মৃত্যুর নীলাভ কঙ্কালের ঠোঁটে
চুমু খেয়ে। মরা সিহর্স, অক্টোপাস আর অসংখ্য জলজ প্রাণীর
ফসিলে সাজানো চির প্রেমহীন উৎকট বাসরে।

বালিশে কান পেতে ঝড়ের শব্দ শুনতে হয়

বালিশে কান পেতে ঝড়ের শব্দ শুনি—
যে ঝড় এসেছিল পাগলা হাতির মতো কুঁড়েঘরের দিকে তেড়ে
সেই কোনো সুদূর শৈশবে। এখন আর তেমন তীব্র করে
ঝড় আসে না। এখন তীব্র করে আসলে কিছুই আসে না—
না প্রেম, না বিরহ, না শীত, না গ্রীষ্ম...
বালিশটা আমার একটা গোপন শঙ্খ
যেমন শঙ্খ কানে নিয়ে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যায়
প্রতি রাতে ঘুমাতে এসে বালিশে কান পেতে ঝড়ের শব্দ শুনি
সাদামাটা দিন শেষে কিছু কাল্পনিক বিপ্লবের কাহিনি।
বহুদূরের কোনো জানালা হতে তোমার হাত বেরিয়ে পড়ে
আমাকে খুঁজতে আর আমার হাতও এগিয়ে যায়
তোমাকে ছুঁতে। আমাদের হাতে ধরা হাত লম্বা হতে হতে
একটা ব্রিজ বানায়। ঘুমের ভেতর বহুবার যাই আসি আমরা—
ব্রিজ পারাপার করতে করতেই সকাল হয়ে যায়।
সকাল হয় তোমার আগমনের আশায়—
পৃথিবীর সব ঘড়িদের সাথে আমিও একমত যে,
সুসময়ের জন্য আমাদের অনেক খারাপ সময়
হাসিমুখে পার করে দিতে হয়।
তখন এরকম বালিশে কান পেতে ঝড়ের শব্দ শুনতে হয়...

একের পর এক গন্তব্যের নিশানা আর নিস্পৃহ ক্লান্তি

গন্তব্যের শ্যাওলা ধরা ছায়া
পেছন থেকে সটকে পড়লে
ভয়ে ভয়ে ভাবি
এখন কোথায় যাই?
উত্তর দিতে না পারলে
পাখি ধরা খাঁচায়
বন্দি করে নিয়ে যাবে শূন্যতা।

সকল অস্থির বালুকণা
ভূমিকম্পে কেঁপে কেঁপে
জড়ো হতে চাচ্ছিল
সূর্যঘড়ির গর্ভে ভাঙা আয়নার বাগানে।
প্রত্যেকে আমরা নিজেকে
চলন্ত গাড়ির মস্তিষ্ক ভেবে
কোন দিকে ঘুরব?
কোথায় পাবো দেখা কুটিল শয়তানের
যে আকাশে জাল বিছিয়ে
ছেড়ে দিয়েছে কিছু
মাংসভোজী সোনার মাকড়সা?
কবে তারা আমাকে খাবে?
আর শেষ হবে
জলরঙে জল আঁকার অপ্রকৃত খেলা?

যে পাহাড়ি পাখিরা
বহুকাল ধরে পাহাড়ের অধিবাসী,
তারা জানে কি

পাহাড়ও লুকাতে চায়
ঘুমন্ত পাখির ডানায়?
সব কথা জানাজানি হয়ে গেলে
আলো কুড়ানি রাতের বাতাসে
বন-জঙ্গলের মতো অবারিত হয় নীরবতা।
নীরবতা নয় বিচ্ছিন্নতা...
পৃথক পাতায় শিশির হয়ে আটকে থেকে
ঘামের মতো মনে জমছে ক্ষয়।
কাছে থাকলেই আরোগ্য হয়।
কথা বললে কেটে যায় ভয়।

হাঁসফাঁস পাতাল

বেনসন লাইটের সাদা ডানা মেলে চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে হাসপাতাল।
হাঁসফাঁস পাতালে গিয়েও লুকাতে কি পারো?
আকাশে বিছানো সারি সারি মেঘের বেড।
সমুদ্র তলে প্রবালের রাস্তায় ছুটছে সে হাসপাতালের নীল অ্যাম্বুলেন্স।
আমার বাবা সেখানে এক বিনা বেতনের ডাক্তার।
মা হলো ভালো এবং বোকা টাইপের একজন নার্স।
আমার ভাই, যার জন্মই হয়েছিল হাসপাতালের জ্বলন্ত ওটি-তে
বৃষ্টির ঝাপটা হয়ে, সে এখন সারাদিন চুপচাপ
ক্লিনারের কাজ করে যায়। আমার বন্ধু ইন্টার্নশিপ করছে হাসপাতালের মর্গে।
আর আমি প্রতিদিনের বেহাল ধান্ধা সেরে বেহালা বাজাই
হাসপাতালের ঠান্ডা লাগা ছাদে।
আমাদের প্রত্যেকের একটাই যৌথ ছদ্মনাম 'হাসপাতাল'।
আমাদের প্রত্যেকের একটাই যৌথ অসুখ 'পেইন'।
আমরা কেউ কাউকে নিচু বা উঁচু ভাবি না, ভাবি সমান্তরাল।
কারো বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ নেই, আছে অশেষ আড়াল।
হাতে ধরা নষ্ট আপেল ছুড়ে মারি বন্ধুর দিকে,
আর কোথা থেকে যেন আমার মাথাতেও
অসংখ্য নষ্ট আপেলের ঝুড়ি উগড়ে পড়ে।
তারপর রাজনীতিবিদরা আমাদের সবাইকে নিচে পড়ে থাকা
সেই নষ্ট আপেলগুলো গিলতে বাধ্য করে।
তাই আমরা কেউ কাউকে নিচু বা উঁচু ভাবি না, ভাবি সমান্তরাল।
কারো বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ নেই, আছে অশেষ আড়াল।
হাসপাতাল! হাসপাতাল!! হা হা হা হাসপাতাল!!!

ভবিষ্যতের ডাইনোসর

ফুটওভার ব্রিজে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে ঘামতে ঘামতে
হঠাৎ দেখি ব্রিজটা একটা নিকষ, থমথমে পোড়োবাড়ি হয়ে গেল।
সেই পোড়োবাড়ির ঝাপসা মেঝেতে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া
অনুভূতির খরগোশগুলোকে ধরতে চার হাতে-পায়ে ছুটছি।
দেয়ালে উটকো বট-পাকুড়ের শাখা, যেন কোনো
মমি হওয়া ডাইনির হলুদ নখ। মাথার ওপর উড়ে যায়
বিবর্ণ চাঁদ। অন্ধকারের পালকে ভর্তি একটা গুহায়
সাবধানে মায়াজাল বুনছে সোনালি মাকড়।
দরজা খুলতেই গলিত চোখ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো কালো বিড়াল...

নাহ, আজকাল যা দেখি সবই বৈপরীত্যের বিভ্রম।
যা বুঝি, তা কেবল ভুল বোঝাবুঝি।
কেউ কি পারে অন্যের ব্যথার ধার সশরীরে বুঝতে?
হয়তো পারে সমব্যথী হতে। অনেক অনেক সমব্যথীর
কাশফুলের মতো আঙুল আমার পিঠে আর আমি
ঝুঁকে আছি আকাশের মতো স্বচ্ছ সরোবরের একদম নিচে।
সেখানে মেঘ ভেসে যায়, লাল-সবুজ-নীল মাছগুলো
ভেজা পাউরুটির মতো মেঘ ঠুকরে খায়।
নাহ, অনেক সময় চলে গেল ঘড়ির
ওপর দিয়ে। পড়ে আছে জমাট ধুলো।
আমাকে এবার উঠে বসতেই হবে এবং থামাতে হবে
স্টপওয়াচ, যেখানে একাকিত্বের অভয়াশ্রম।
শুনেছি আমার জন্মের বহু আগে মানুষ টোটেম
বানিয়েছিল নেকড়ের মতো তেড়ে আসা একা থাকার
শীত তাড়াতে। কেননা, মানুষই মানুষের শ্রেষ্ঠ উষ্ণতা।

এখন প্রতিদিন আমার সাথে তোমার, তোমার সাথে তার,
তার সাথে অন্য কারো একা হওয়ার প্রতিযোগিতা।

আরো একটা ঢিল পড়ল নিস্তরঙ্গ পুকুরে। কিছু তরঙ্গ তুলে
ডুবে গেল কাদামাটির গভীরে। মহাকাশে তারারা
আয়না হাতে নিয়ে ঝিলমিল রোদ্দুর প্রতিফলিত করছে
পৃথিবীর কালো কালো পোড়া শিকড়ে।

বিকালের তির্যক আলোয় বাদামি মরুভূমিতে রণপা পরে হেঁটে যায়
দীর্ঘ কঙ্কালের ছায়া। কই যায়? মরুভূমির ভয়ানক শেষ প্রান্তে???
তারপর কী আছে কেউ জানে না।
তারা যেখানে খুশি সেখানে যাক।
মানুষ আরো আরো একা হয়ে যাক।
আদিম অ্যামিবা বিভাজিত হতে হতে এমনটাই তো হবে,
যখন আর বিভাজন সম্ভব না।
তখন হয়তো মানুষও একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে
ডিম ফোটা ডাইনোসরের মতো বেরিয়ে আসবে
কুসুম রোদে নীলাভ ঘাসের উপত্যকায়।

ছাতিম ও অন্যান্য

১.

কেউ কখনো বলে নাই
কিন্তু মনে হয় কেউ কখনো বলছিল যে,
বেদনাদের লুকায়ে রাখতে হয়।
যে যত বেশি বেদনা লুকায়ে হাসিমুখের বিজ্ঞাপন
দিতে পারে, সে তত বেশি বিজ্ঞ।
তাই এই বেদনা লুকানোর প্রতিযোগিতা চলে
মানবকুলে দিবা-রাত্র। বেদনারা
যেন কিশোরী কন্যার প্রথম পিরিয়ড
সমাজের সবাই যাকে ঠোঁটে আঙুল চেপে বলে:
কাউকে বোলো না।

২.

প্রেমহীন জীবন মন্দ না—
অনেকটা সবজি খিচুড়ির মতন
হেলদিও, টেস্টিও
কিন্তু তারপরও
কী যেন নাই, কী যেন নাই!

৩.

ভেজাল থাকার ব্যাপারে আজ আমরা নির্ভেজাল।

৪.

বহুদূরের পাহাড়ের চূড়ায়
ফুটে আছে যে ঝাঁকে ঝাঁকে ছাতিম ফুল
তার সুবাস এখানে আমার জানলা দিয়ে আসে।

আসতে আসতে সুগন্ধরা একটা পথ তৈরি
করে ফেলে বাতাসে। আমি তার নাম দিই
সুগন্ধি পথ। সেই পথের ধারে ফুটপাতে
সন্ধ্যা হলে গিটার হাতে হাজির হয় পাখিরা
আর চায়ের ভ্যান নিয়ে চা ওয়ালা ফড়িং।
দূরে থাকা সমুদ্রও এসে যোগ দেয় তাদের সাথে।
সেখানে সবাই দেহের খাদ্যের চেয়ে হৃদয়ের
খাদ্যের জন্যে উদগ্রীব। সেই সুগন্ধি পথ ধরে
হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিলাম, মানুষের সুন্দর
হৃদয়ের গন্ধ ছাতিমের সুগন্ধের চেয়েও তীব্র।

অন্ধ তারা

আকাশে টর্চ মেরে তারা দেখতে চেয়ো না;
নদীতে খুঁজো না কাশফুল, সাদা মেঘকূল
যায় ভেসে যায়... তার চেয়ে পাঁজরের দেয়াল থেকে
একটা ঘামে ভেজা ইট খুলে নাও।
হীরক রোদ্দুরে গাছের পাশে এসে
ছায়াটা দেখে যাও।

ফিরে আসো জনাকীর্ণ পথে...
আমাদের একমাত্র নাম জনগণ।
শূন্যতা দিয়ে যারা প্রতিক্ষণে
অন্যকে করে চুম্বন।
প্রতিদিন নিজেকে ছাঁচের মেশিনে
উৎসর্গ করতে আর অযথা মায়া লাগে না।
তবু কোনোদিন যদি আসে ক্যারাব্যারা
কোনো ফ্লাইং সসার,
পৃথিবীকে বলে দেবো: গুড বাই, গুড বাই ডিয়ার!
এরকম অন্তর্ধানে তোমরা কিছু
ভাবলেশহীন ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ো
বোমায় ধূমায়িত বাতাসে।
কম্পনের মাত্রা বাড়তে বাড়তে
ভূমিতে চারণশীল যা যা কিছু আছে
খনিজ সম্পদের মতো
ভূগর্ভে মিলিত হবে; কলম বা কনডম
কেউই বাদ যাবে না...
পদার্থের ধর্মই যা করার করবে
শুধু এক একরঙা রংধনু বিস্ফোরণ হতে

দূরে অবস্থান করে
মুখ ঢেকে একা একা কাঁদবে।

“যা ছিল বলার, কিছুই বলা হলো না!”

অপরূপ ডানাগুলো

[কথিত আছে, একদিন গভীর রাতে তারা সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে ডানাগুলো জড়ো করে তাতে অগ্নি সংযোগ করেছিল। লেলিহান শিখার উজ্জ্বলতায় তাদেরকে কামদেবতা বা কামদেবী বলে মনে হচ্ছিল। এবং এরপর তারা সেই ভস্ম শরীরে মেখে হেঁটে চলে গিয়েছিল সমুদ্র সঙ্গমে...]

অপরূপ ডানাগুলো ইচ্ছে করে
অকটেন ঢেলে পুড়িয়ে দিই।
এসিডদগ্ধ মানুষের মতোই তারা
কাতরাতে আর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকুক
পৃথিবীর ক্লীব নাভিমূলে।

যে আলো চোখে লাগে
কী দরকার সেই প্রখর, সবজান্তা আলোয়?
জোনাকির আলোতে যদি
চিনতে পারি সীমানাহীন নদী...
একদা যে ডানাগুলো
সুন্দর আর বর্ধিষ্ণু হয়েছিল
আমাদেরই ঘামে-রক্তে-নির্বাণে,
আজ সেই ডানার প্রতিপক্ষে
সহজ এবং ক্ষমাহীন আমরা!

চেইন অর উইংস অফ আফিম

প্রতিদিন আমি একজনকে হত্যা করি। তাই আমি একটা খুনি। প্রতিদিন আমাকে খুন করে কেউ। সে আমার মতো অসংখ্য অসংখ্যকে নিঃশব্দে খুন করে। তাই সে একজন বড়ো মাপের বজ্জাত খুনি। বড়ো মাপের বজ্জাত খুনিটাকে খুন করতে চাই। কিন্তু সে কোনো প্রাণসম্পন্ন বস্তু না। সে একটা বাক্স। বাক্সটা ভাঙতে হবে। বাক্সের মধ্যে বিপ্লব আর বিশ্বযুদ্ধের কিছু পলাতক ধোঁয়া আর প্যানিকের পিনিক ছাড়া কিছু নাই। যে হাতগুলো বাক্স ভাঙতে গিয়েছিল, সেসব হাতের কঙ্কাল পড়ে আছে বাক্সের পাশে ইনস্টলেশনের উপাদান হয়ে। বাক্স ভেঙে দেখি ভেতরে কিছু নাই! বাক্সের ধোঁয়া আর পিনিক নিয়েছি নিঃশ্বাসে, ভেইনে। তার পেইন ঘন দূষিত রক্তের নদী পেরিয়ে বিষাক্ত নীলে স্বপ্নময় সমুদ্রে মিশেছে। সোনার খনির অভিশপ্ত সূর্যের রশ্মি মেখে সামুদ্রিক প্রাণীরা মরে ভেসে উঠেছে। সেই পানি পান করে জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের সকল সদস্য ইন্তেকাল ফরমাইছে। মৃতদেহে ফর্মালিন পালিশ করার মতো কেউ আর অবশিষ্ট নাই। সবাই মিলে পচে উর্বর করুক পৃথিবীর দীর্ঘ অতৃপ্ত পোড়ামাটির দ্বীপপুঞ্জ।

কুৎসার উঁইঢিবি

আমার মৃত্যুর পর যা যা ঘটবে
সেসব ঘটনার ছেঁড়া দ্বীপের মাথায়
অন্ধকার আফ্রিকার মাটির নিচে পচতে থাকা
হাড়ের মদের মতো সাদা
একটা চাঁদ ফড়িঙের ডানায় করে নামাবে
আকাশের জানালার শত শত গজ রুপালি পর্দা।
পর্দার ঢেউয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আবার ফিরে আসবো আমি।
আমার পশুর মতো নখ আর নোংরা লেজ, হলুদ বীভৎস
দাঁত নিয়ে। মৃত্যুর পর যেসব সম্পত্তির মায়া
কাটাতে না পেরে আমাকে ফিরে আসতে হবে
তার ওপর এক পরত সন্দেশের মতো
কুৎসার বিশাল উঁইঢিবি গড়ে উঠতে দেখি।
সেই দানাদার ঢিবি ভেঙে সুগঠিত হবে আমার শব।
আমি কুৎসিত বলেই মনে শান্তি পাই,
পণ্যের গুঞ্জন আর মানুষের বিচ্ছিন্নতা দিয়ে তৈরি আয়নায়
আমার সুন্দর হওয়ার দরকার নাই।
শান্ত নদীতে নৌকা চলে গেলে
জল আঁকে আলোড়নের রেখা। তাতে শিহরিত হয়
তীরের কর্দমাক্ততা। সেভাবেই কুৎসার তারকার জ্যোতিতে
কিংবা খ্যাতিতে পুড়তে
বারেবারে এই ভুল অরণ্যে ফিরে আসা।
বারবার শুরু থেকে শুরু ভালোবাসা।

শূন্য

আমার কোনো ভর নাই।
আমার কোনো ওজন নাই।
বলার মতো কোনো কথা নাই।
আমি একটা ছেঁড়া তারের গিটার।
আমার মতো আরো অসংখ্য ভাঙা গিটার
একজনের গায়ের ওপর আরেকজন স্তূপ হয়ে
পড়ে আছে সমুদ্রের শ্যাওলাধরা ডার্করুমে।
কেবল অচেতন ইচ্ছেগুলো পাখি হয়ে পাড়ি দেয়
শেকলবন্দি আকাশের গায়ে।
আমরা আসলে বলতে চেয়েছিলাম কিছু, কিন্তু
বাতাসের ঘন আর্দ্রতার কুয়াশায়
কোনো উচ্চারিত শব্দই পৌঁছায়নি অপর পৃষ্ঠায়।
কিংবা এই ঘন কুয়াশার লাভা উপচে পড়ছে
আমাদেরই কণ্ঠের পাহাড়ি ঝরনা বেয়ে।
বোধহীন জন্মের পরিণতি নোংরা ভিখারির
পুরু ঝাপসা লেন্সে নিলাম হেঁকে যায়।
আমার কোনো ভর নাই।
আমার কোনো ওজন নাই।
নাই জন্ম পরিচয়।
আমার জন্মের অনেক আগে আমার ক্রীতদাস বাবা
সূর্যের গোলাপি কালারবক্সে পাপহীন যে প্রায়শ্চিত্য করেছিল,
তার পাপে হয়েছি কালারঅন্ধ।
সকল ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় তাই
মরিচার ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাই
রংধনু মাছের লেজে ভর করে
শত প্রজাতির ডুবো যুদ্ধজাহাজ আসছে ধেয়ে।

বাঁধা আছি আমরা সমুদ্রতলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের রশিতে।
আমার কোনো ভর নাই।
আমার কোনো ওজন নাই।
আমার অস্তিত্ব আমি ভুলতে চাই।
আমার মৃত্যু সময়ের নগণ্য অপচয় জেনে
সঞ্চয় করি বিপুল ধ্বংসের কনসার্ট।
যে তুমি বসে আছ কনসার্টের গলুইয়ে
বুকে লুকিয়ে বিস্ফোরক মেঘ,
তোমাকে আমি ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দেবো।
আর তোমার বিপ্লবের নকশা চুইংগামের মতো চিবিয়ে খাবো।
এ ধোঁয়াচ্ছন্ন শিকার শিকার খেলায়
মাতি বন্য বন্য চটুল লম্পট লীলায়।
হারাবার কিছু নাই
ক্ষতির সম্ভাবনা কিছু নাই
কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে না বিনষ্ট,
কারণ আমরা মমি প্রজন্মগত।
আমাদের ঘড়ির কাঁটা আমরা উপড়ে ফেলেছি।
আমাদের দুশ্চরিত্র আইডল শূন্যতার বিপরীতে
এক ঝাঁক রঙিন কর্পোরেট বেলুন উড়ছে শুধু উড়ছে।

ভাগ ভাগ বিভাগ বিভাগ

অপরিচ্ছন্ন সিরিঞ্জে আর নিতে চাই না প্যাথ
জায়গাটা হলুদ হয়ে ফুলে আছে
ভেতরে চাক বেঁধে আছে অর্থহীনতা
ভেতরে স্বপ্নভ্রষ্ট হাঁটছে শ্বাসরুদ্ধতা

মোটা দড়িতে আর পালিশ করতে চাই না চর্বি
দড়ির হেলুসিনেশন আমাকে ছেড়ে লুকাক ভূ-তলে
হয়তো মহাবিশ্বের কোথাও আবার দুর্ঘটনা ঘটেছে
তাই বলে তা 'অবধারিত' ছিল না

শিশুকে কেন অ্যাঞ্জেল বলি?
শিশুরা নির্বাণের আগুন নিয়ে খেলে না
যদিও সে ক্ষুদ্র ফ্রেমের আকাশে
হঠাৎ মেঘের মতো নির্বাণের ছাতা নেমে আসে

ছাতায় ছাতায় যোগফল আমাদের আয়ু
ছাতার রোমহর্ষ অস্বীকার করছে পায়ু
কেননা জীবৎকাল শুধুই হরিৎকাল
শূন্যের সব রং মূর্ত হোক যথাযথ মৃত্যুর পর

শান্তি নামের ছেলেটা

শান্তির সাথে মাঝে মাঝে কথা বলি শান্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু সে নিজেই খুব প্যারায় আছে। মা অসুস্থ, ভাইবোনের পড়ালেখা, বাবা বেকার, কিছু বকেয়া ঋণ আর তার চাকরিটা ছোট্ট। এই নিয়ে সে দুঃখও করে না। শুধু সুযোগ পেলে একটু নদীর কূলে বসে থাকা তার বিলাসিতা। কিন্তু নদীটাও ভালো নেই, দিনে দিনে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার শরীর, নিঃসন্তান। নদীর ডাক্তার বলেছে, ঔষধের চেয়ে জীবনে ভালোবাসা বেশি দরকার। নদীও শান্তিকে শান্তি দিতে পারল না। রাত হলো, তারার বাতি জ্বলল আকাশের প্রেক্ষাগৃহে। কিছু বক অন্ধকারে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল কাশবনে। আর তাদের ঘুমন্ত চোখের কোটর থেকে লক্ষ লক্ষ জোনাকি বেয়ে বেয়ে নেমে একটা শান্তির স্রোতধারার মতো বয়ে যেতে লাগল শান্তি নামের ছেলেটার মগজে।

বনে ফিরে যাই

বন্যতা, চলো বনে ফিরে যাই
ছায়ার ভেতরে ফুলকি ফুলকি রোদ বাতাসে দুলে
তীব্রকণ্ঠে ডাকছে তোমাকেই।
এখানে বদ্ধ ঘর—
বদ্ধ ঘরে পেপার পড়ছে রোবট দানব
তার পায়ের কাছে লেজ নাড়ছে রোবট প্রাণীর দল
তারা খাবার খায় না—খায় ইলেকট্রিক চার্জ
তারা নিঃশ্বাস নেয় না—কারণ বাতাস ঘুরে গেছে
অন্য কোনো গ্রহ বরাবর।
তাদের নেই মৃত্যু নেই—
তাই তাদের জীবনও কি আছে?
চলো দুধ মাখা বাটি, আদরের বিছানাটি
ফেলে এক্ষুণি পালাই—
জীবন যদি জীবন বীমা হয়ে যায় থাকবে না কিছুই।
খাবারের দুর্ভিক্ষ হয় হোক, স্বাধীনতার যেন না হয়
নিশ্চিন্ত জীবনের ফাঁদ ক্রীতদাস বানায়
জেনে গেছি একথাটাই।
আমার সন্তান শিখবে না অক্ষর, সে চিঠি লিখবে
খেত ভরা সবুজ বর্ণমালায়।
গণনা করার সংখ্যা শিখবে না—গণনা বাজারমূল্য চেনায়।
দেখো ঢেউয়ের হিসাব রাখে না সমুদ্র
আকাশ জানে না কত তারা ঝরে পড়ে প্রতিদিন
আর কত তারা জন্ম নেয় তার ইতিবৃত্ত।
অ্যাকুরিয়ামে ডোবে কালিমাখা সূর্য—
নদীতে জোয়ার দিয়েছে টান—
জোনাকি পোকার সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলব

চলো শহুরে এসব আলো নিভাই এবার।

বন্যতা, চলো বনে ফিরে যাই...

নামহীন শ্রমিকের গান

আমি নই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা
কোনো নির্ভীক যোদ্ধা।
আমার নামও নয় হারকিউলিস, নেপোলিয়ান
কিংবা দিগ্‌বিজয়ী অশোক।
তবু আমি যোদ্ধা, এক নামবিহীন অক্লান্ত যোদ্ধা—
পৃথিবীর বুকের ভেতর কফের মতো জমে থাকা
ঘন অন্ধকার দু'হাতে খুঁড়ি।
এত আলোর হাসি তোমাদের ঘরে
আমার হাতে জ্বলে নিকষ আঁধারের কুপি।
অন্ধকারের পুরু মেদ কাটার মতো
নেই কোনো ধারালো হাতিয়ার
শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডকে অস্ত্রের ভঙ্গিতে ধরে
কেটে যাই সময়ের অনন্ত হাহাকার।
মায়ের সাথে নবজাতকের নাড়ি কাটার
ব্লেডের মতো সূক্ষ্ম এক ফালি রোদ
ঝলকে ওঠে অসীম কালো এই গহ্বরে।
হাড় হাভাতের মতো সেই রোদের কণা
চাখতে থাকে আমার অন্ধ অতৃপ্ত চোখ।
এই গুহা থেকে অনেক অনেক ওপরে
একটা পাখি উজান বাতাসে ডানা মেলে—
আমি চিরকাল ওই পাখিটার মতো উড়তে চেয়েছি।
আমার ভাগে পড়েনি কখনো খাঁচার মাপের
এক টুকরো ছোট্ট আকাশ—
তাহলে সেই আকাশ ঘেরা খাঁচাতেই
কাটিয়ে দিতাম রোদে-জলে বারোমাস।
আমি নই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা

কোনো নির্ভীক যোদ্ধা।
আমার নামও নয় হারকিউলিস, নেপোলিয়ান
কিংবা দিগ্‌বিজয়ী অশোক।
তবু আমি যোদ্ধা, এক নামবিহীন অক্লান্ত যোদ্ধা—
বোদ্ধা, আমি সেই প্রাচীনকালের বোদ্ধা—
যে বুঝে গেছে ঈশ্বরও স্বয়ং একচোখা।
আমার ঘামের গন্ধে নোংরা হাতে
ঈশ্বর কখনো আসবে না এই গুহায়।
আমার মতো অমানুষ তাকে ভালোবাসে একতরফা
আর মহান ঈশ্বর একতরফা ভালোবেসে যায়
ধনকুবেরের প্রাসাদে পারফিউমের বিভোরতা।
আমার প্রতিটা যুদ্ধ চাপা পড়ে যায় মাটির নিচে
বন্দি আমি কালো খনির অগাধ গরাদে।
দাবানলে ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো একা—
সুড়ঙ্গ কেটে কেটে উঠি ওপরের দিকে
কোনো হাত এগিয়ে আসে নাই তুলে নিতে।
আমারই নিজের এক হাত দিয়ে তুলি নিজের অন্য হাত
যেন তুলছে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভীষণ মমতায়।
দুইটা ভিন্ন হাতের অনুভূতি নিয়ে কাটে দিনরাত।
আমার হাড়ের মজ্জা শুষে চাকা চলে
জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় অর্থযন্ত্রের।
আর আমার জীবন ছেয়ে আছে অনর্থক অভিমানের মন্ত্রে—
একদিন শীতের সকালে পাতার ডগা থেকে
এক ফোঁটা শিশির ঝরে কপালে
ছোটোবেলায় ঘুম পাড়াতে গিয়ে মায়ের অশ্রু
যেভাবে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ত আমার গালে।
গাছটাকে হঠাৎ মা ভেবে তাড়াহুড়া করে
যতই ওপরে উঠতে যাই কষ্টেসৃষ্টে

উন্নাসিক সভ্যতার এক জোড়া ভারী পা
আবার ফুটবলের মতো আমায় ছুড়ে মারে
মাটির তলায় মৃত্যুর গভীর গোলপোস্টে।
যতবার আমি এ নারকীয় পাতালপুরী ছেড়ে
উঠতে চেয়েছি রোদ আর জোছনার উঠোনে
ততবার কারো না কারো নির্মম পা
ফিরিয়ে দিয়েছে অন্ধকারের তিক্ততা।
তবু হাল ছাড়ি না আমি, এত বেহাল হয়েও
আঁধারে থেকে আঁধারের বিপক্ষে এ আমরণ যুদ্ধে।

না জন্মানো শিশুর গান

তোর নীল ঢেউ ঘুমের ভাঁজে জেগে থাকে
আমার না ঘুমানো সকালের অবসাদে ফিরে আসা
এলিয়েন কাক। তোর অলসতার শৈবাল দ্বীপে
লোভীর মতো আমার বেড়াতে যাবার তাড়াহুড়ার সাথে
প্রতারণা করে এক বাকশো ব্যস্ততার ফাঁদ।

জন্মের পলিমাটির ম্যানগ্রোভ বন থেকে ছিনতাই হয়ে যাওয়া মানে
জীবনের দায়ে একটা পঙ্গু টবের দেয়ালে বনসাই হয়ে বাঁচা—
বনসাই কারখানায় যেভাবে জিম্মি তোর পূর্বপুরুষের বন্যতা।

তোর না বানানো রূপকথার দোলনায়
আমি সমুদ্র হয়ে দিই বাতাস—
আকাশ কেটে আমাদের দেখা করার জানালাটা
হ্যাক করে যুদ্ধ রঙের অক্টোপাস...

ড্রোন বোমার মোমবাতি জ্বালিয়ে তোর শেষ জন্মদিনের কেক
কাটতেই ক্রিম ভেঙে বেরিয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
রংধনু ডানার পাখি। শিশুদের চোখ ভালোবেসে এক বুড়ো নীলতিমি
স্বপ্ন দেখার বাবেল উড়িয়ে স্কুলভ্যানকে দেয় ফাঁকি।

না পার হওয়া সাঁকোর আড়ালে তোর ছায়া জলে—
আমি সেই জলে মিশে থাকা মেঘের জালে ধরি রোদ।
অ্যাম্বুলেন্স ডাকা ভোরে হুইসেল বাজায় সূর্য মোরগ।

তোর না জন্মানো হাতের তারায় পুনর্জন্মের সেবিকা সাজে
আমার আকাশ। একাকিত্বের আয়নার পারদে

তোর মুখের প্রতিবিম্বে জোড়া লেগে যায় আমার মুখের যত হাঁসফাঁস।
তোর না ভাঙা ঘুমের শিথানে পৃথিবীর সব কসাইয়ের ছুরির গান
দুই হাতে সরিয়ে করে দেবো নৈঃশব্দ্যের ফুলবাগান।
রোবট রোবট এই স্বার্থপর ভালোবাসার হট্টগোলে
উন্মুখ নাগরিক চিলেকোঠার অতলে
তাহলে চল চুপি চুপি আমরা একটা প্রেমের চুক্তি করে ফেলি।

দায়মুক্ত স্বাধীনতার বিষ

নিজের ক্রুশের ভার নিজেই বহন করুক যীশু—
সারা পৃথিবীর দায় নিয়ে জন্মেই ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার হওয়ার জন্য কাঁপতে থাকুক মানব শিশু।
শুধু কবিতা সমস্ত দায় ধোলাইখালে ভাঙ্গারির দোকানে বিক্রি করে দিয়ে খেয়ে নিক দায়মুক্ত স্বাধীনতার বিষ।

আধুনিক চাকর

কিচ্ছু ভাল্লাগে না তোমার, তবু মাঝরাতে
জানালার কাছে আসা মৃত্যু রঙের সসার
ড্রাকুলার আছরের মতো ঝাঁটা মেরে বিদায় জানাচ্ছ
আর সকালের পরীর ডানায় না চেনা ফুলের গন্ধ খুঁজছ।

কিচ্ছু ভাল্লাগে না তোমার, শুরু থেকে শেষ
আর শেষতক শুরু একই গানের অনুরোধের আসরে
গাইতে কি ভালো লাগে? তবু বিশেষ এক রংধনুর প্রেমে
তার রং বাঁচাতে বিসর্জন দিচ্ছো তোমার রক্তের অনাহুত শিশির।
কিচ্ছু ভাল্লাগে না তবু ছেড়েও যাচ্ছ না মরা সূর্যের দেশ।

কিচ্ছু ভাল্লাগে না শুনে যাচ্ছি আর গুণে যাচ্ছি
ঘামের মোড়কে কাঁচা লবণের স্বাদ। যে ছেলেটা
সময়ের জারজ পেটে ডুবুরি হয়ে আনতে গিয়েছিল কবিতার মেঘ
সে আমার সৎ বন্ধু ছিল। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার আগে
সে চিৎকার করে বলেছিল: ব্যাঙের ডিমের মতো ঘন সমস্যা যেখানে
সেখানে পুনর্জন্ম হয় ঈশ্বর আর শয়তানের।
সেই ঈশ্বর আর শয়তানের প্রিয় ফুটবল খেলার মাঠে
আমজনতা দর্শক হয়ে জীবনের শিরায় শিরায়
ডেকে যাচ্ছি সামুদ্রিক ঝড়। কিচ্ছু ভাল্লাগে না বলে
একটা কোনো অসীম ভালোবাসার বীজ এখানেই করেছি রোপন।

রাস্তার পাগলের গান

এই রাস্তা কবরের শূন্যতা হতে অনেক উঁচু আর
তোমাদের নাক উঁচা বিল্ডিংগুলার চাইতে বহু নিচু;
এখানে শুয়ে শরতের মেঘের জঙ্গল দেখি সরাসরি তাকিয়ে।

পায়ে পায়ে চকমকি পাথরের চিহ্ন রেখে যায় সময়—
আমি অসময়ের চিহ্ন লুকিয়ে রাখি উল্কা ঝরার ক্ষতস্থানে...

যখন তোমার ডানার নীল পালকে সূর্যাস্তের রক্তের চেয়ে লাল
বেদনার ছত্রাকের আক্রমণ;
তোমার ডালে বসা ফিঙে পাখিটার রোস্ট পার্সেল হয়ে চলে যায়
বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর পাকস্থলীর মরু গুহায়।
সেই মরা পাখিটার নতুন জন্ম নেয়া ভ্রূণের সুর
আমার কাঁধের ওপরে বসে বলে:
জীবন এক রাক্ষুসে পিরানহার চাওয়া পাওয়ার বাজারে
নিলামে বিক্রি হওয়া সমুদ্র...

তোমাদের দিকে মাথা তুলে দেখি তোমাদের মাথা
নতজানু হয়ে আছে মেশিনের পার্টসের টুকিটাকি যান্ত্রিক গোলযোগে।
তোমাদের পাগলাটে ঈশ্বরের মাথায় ছাতা ধরে আছে
ডলার, ইউরো, টাকার গর্ভজাত অপ্সরী সুন্দরী—
তোমাদের কমিউনিকেশনের ধারালো ছুরিতে কাটা
আমি সেই মিস কমিউনিকেটেড একাকিত্ব।
তবু তোমাদের নিঃসঙ্গতার চাইতে আমার একাকিত্ব
আরো অনেক বেশি মাত্রায় সহনীয়।

তোমরা তোমাদের উন্মাদ ঈশ্বরের চিকিৎসাশাস্ত্রের বই খুলে

কাউকে যখন পাগল বলো সাথে সাথে
নিজেদেরকেও ছুড়ে মারো সুস্থ থাকার অসুস্থ ভণিতায়—
পায়ে পায়ে চকমকি পাথরের চিহ্ন রেখে যায় সময়—
আমি অসময়ের চিহ্ন লুকিয়ে রাখি উল্কা ঝরার ক্ষতস্থানে...

বন্ধু

গাছের শিকড়ের বেঞ্চিতে কয়েকটা জাতিশ্বর পাখির মতো বসে
চল আবার আড্ডা দিই। মেঘের মতন মেঘহীন শহরের রোদে ঘুরে ঘুরে
আবার চল নাগরিক হৃদয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি:
কেমন আছ? কেয়া ঝোপের মাথায় ফুল ফোটা সন্ধ্যাতারা
হয়ে চল আবার ফুটি, জীবন্ত শরীরের কবরে ঘুমিয়ে থাকা নিজেকে জাগাই।

শামুকের খোলের ভেতর মরে আছি তুই আমি সব—
সেই খোলের গায়ে রং লাগাচ্ছে অসময়ের শব;
গুহা ছেড়ে রংধনুর পথ ধরে ফিরছি কেবল সেই নিঃসঙ্গ গুহায়।
আর সেই গুহার চারপাশে রক্ত মাখানো আকাশ আঁচড় কেটে যাচ্ছে...

আমার ওপর তোর কোনো অভিমান নেই কেন আর?
নিজেকে বেচা টাকা দিয়ে সাজাচ্ছি দেখ নিজের উপহার।
আমাদের ব্যক্তিগত কবরখানায় ঈশ্বরের চোখের বৃষ্টি পড়ে মাঝরাতে—
কেউ কাঁদে না, কেউ আসে না হাসিমুখের জন্মের শুভেচ্ছা নিয়ে ফুল হাতে।

নৈঃশব্দ্যের গ্রহের বাইরে ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডলিস্টের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে
উড়ে যাচ্ছে অসংখ্য সুতো কাটা গ্যাসবেলুন। এই পৃথিবীর সর্বমোট
জীবিত মানুষের চেয়ে বেশি বন্ধু সংখ্যা দিয়ে একাকিত্বের ওজন মাপা হয়।
কেউ কাউকে চিনি না বলে যাকে বন্ধু বলা হয়
সে নেহাৎই কিছুটা পরিচিত ছাড়া কেউ নয়।

সাময়িক অবসর

সূর্যের সাথে ঘুরে ঘুরে রোদে পুড়ে সভ্যতার মুখের র‍্যাশে
দেখো ফাটল ধরা বালুকাবেলা ভেঙে সমুদ্র গলে পড়ে
এখন এই মুহূর্তের যান্ত্রিক ক্যাকোফোনিতে—
তোমরা যত খুশি ছুটতে পারো প্রয়োজনে, অকারণে—
মগজের উচ্চতম ক্যাফেতে বসে ব্যাকরণ না মানা গাংচিলের স্থবিরতা
আমি চাই আমার জন্যে।

তোমার চোখের গুহায় জমা জ্বলজ্বলে তারার রাতে
প্রেতের অট্টহাসির রঙে একলা টিভি চলছে আমার মনে।
কাছে এসে ফুরিয়ে যায় কাছে ফেরার যাত্রা—
চিঠিগুলো জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা ডাকপিয়নের ভারী পায়ের চাপে
বেজে ওঠে অবসন্ন পিয়ানোর গোঙানি কিংবা হয়তো সিম্ফনি।

টাকার ফেরেশতা

টাকার ফেরেশতা যার কাঁধে ভর করে তাকে দিয়ে আর কাজ হয় না।
যাকে দিয়ে কাজ হয়, তার টাকা থাকে না বলে
কাজটা ভালোমতো করতে পারে না বা কোনোকালেই সেই কাজে
হাত দিতে পারে না। টাকা আর কাজের বিয়ে কবে হবে!
আর আমি সে অবাস্তব অবৈধ দম্পতির
বাস্তব প্রথম সন্তান হিসেবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করব???

ভূত

কোথাও যদি একটা ভূতের দেখা পাইতাম
ভূতকেই ভালোবাসতাম।
কিন্তু এই খাচ্চর বিজ্ঞানবাস্তবতা
ভূতকে সেন্সরশিপে আটকে দিয়ে
যুদ্ধের অস্ত্রগুলাকে চুমু খেয়ে ছেড়ে দেয়।

তেলাপোকা

ছবির বাগান তছনছ করে সক্কাল বেলা গেলা তুমি
ঝাড়–হাতে তেলাপোকার পেছনে।
যেমনে হোক তেলাপোকাটাকে মারতে হবে—
ও খেয়ে ফেলে ক্যানভাসে জীবনের রক্ত চুরি করে আনা রংগুলা।

এক রুম থেকে আরেক রুমে ছুটে যাচ্ছ
তোমার মতন অসামাজিক তেলাপোকাটার পেছনে।
যেমনে হোক তেলাপোকাটাকে মারতে হবে—
তোমার সাথে বারবার চুটকি খেলে
একবার তেলাপোকাটা পিষে যায় পায়ের নিচে।
তার সবুজ সবুজ পাকস্থলীর রস ছিটকে এসে
টাইলসের ওপর টাইটেল লেখে: হত্যা!!!

প্রতিদিন তোমাকেও হত্যা করা হয় রাষ্ট্রের অ্যারোসলে;
প্রসূতি সদন থেকে ডোমের বাড়ি—
জিরো কিলোমিটার দূরত্বের প্রোটোকলে।
নিহত তেলাপোকার পাশে ভাবনা তাড়িত
স্বয়ং জীবিত মিস তেলাপোকা।

ঝাপসা বোমা

তুমি বুঝবা, কিন্তু অন্য কেউ বুঝবে না
তাই এই মেটাফোরের ঝাপসা বোমা।

কেউ আমারে দত্তক ন্যাও, আমি আবার আন্ডাকালে ফিরা যাইতে চাই

কেউ আমারে দত্তক ন্যাও, আমি আবার আন্ডাকালে ফিরা যাইতে চাই।
এই বুইড়া বুইড়া মা দুর্গার মতন দশহাতের কাজ দুইহাতে
ধইরা রাখার পেইন নিতে হারকিউলিসের মতো তরতাজা
পেইনকিলারও রিজাইন লেটার ছুঁইড়া দিছে। বাতাসের আঁচড়ে ফেড হয়ে যাওয়া
কৃষ্ণচূড়ার ঠিকানা হারানো অরফানেজ!
তোমার রক্তশূন্য শৈশবে আমার অ্যাডমিশন আটকায়া গেছে।
যুবতী হওয়ার মিশন সাকসেসফুল করতে কামসূত্রের কলা পটিয়সী টিচার
হয়া মিলিয়ন ট্রিলিয়ন অক্টোপাস আইসা হাত-পা বাঁইধা দেয় সামাজিক লোহার সমুদ্রে।
কেউ আমারে দত্তক ন্যাও, নয়তো আজরাইল আমারে
মৃত্যুর দ্যাশে ডিভি লটারি দিয়া বাঁচাও!!!

এখানে গরাদ কিংবা শিকল নেই—তবু কয়েদখানার প্রেমে জড়ানো তোমার হৃদয়।
এখানে নির্জনতা নেই—তবু একার থাকার হাটে সদয় বেচছে তোমার মগজ।

জন্মের পথ ভুলে যাওয়া আমার সোনামানিক! বণিকের হাতে পড়ে
চোখ-কান উপড়ানো ভিখিরি হয়ে বসে আছে মিথ্যার সড়কে।
ভালোবাসার আনন্দে জমে ওঠা মেঘ থেকে যে বৃষ্টির জন্ম হয় তার দেহের ভাস্কর
নিজেই ভাস্কর্য হয়ে তাকিয়ে আছে আকাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা নীল সিলিং ফ্যানের দিকে।
আশার কাঁকন বন্ধক দিয়ে হাটুরে চলে গেছে উজাড় পালপাড়ায়।
জানালাগুলো বন্ধ করে দাও আর দরজায় সিলগালা করে চাবিটা

রাস্তার কোনো উটকো শিশুর পদ্ম হাতে গুঁজে দিয়ে ভুল সংবাদে
জড়ো হওয়া ঠিকঠাক সভা এখানেই ভেঙে দাও।

সাক্ষাৎকার

সকালবেলা অনেক জোড়া পায়ের সাথে তুমি কোথায় যাও?

যাই গার্মেন্টস।

সারাদিন খেটেখুটে কী বানাও?

রঙিন কাপড়।

আর কোন কাপড় তোমাকে পরতে দেয়া হয়?

কাফনের ফাঁপর।

তোমার বেঁচে থাকার ধূসর রং কোন কারখানায় উৎপন্ন হয়?

আমারই রক্ত দিয়ে গড়া শয়তানের কারখানায়।

কয়টাকা মজুরি পাও?

অগুণতি অশ্রুর হীরার সমান টাকা।

তোমার নাম কী?

আমার আলাদা কোনো নাম নেই, দুর্ঘটনার লিডনিউজে আছে শিরোনাম।

শিরোনামহীন

প্রতিদিনের যাচ্ছেতাই ভোগান্তিগুলো একই রকম হতে হতে
প্রতিদিনকে করে তুলছে একটা দিন। শিরোনামহীন।
ভোগান্তির বিষাক্ত সমুদ্র থেকে মৃত তিমির সতেজ নিঃশ্বাস
তৈরি করছে সমকালের ট্রেনের এক একটা বগি।
বগির সাথে বগি যুক্ত হয়ে পাড়ি দিচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্য মহাকাল।

সেই ট্রেনের ভোগান্তির কেবিনে বসে আছি তোমার পাশে,
জানালা দিয়ে দেখছি মানবিক দুর্ঘটনা।
যাকে মহান ঘটনা হিসেবে দেখানো হচ্ছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে
আর বিশ্বাস উৎপাদন করা হচ্ছে প্রেমের ছদ্মনামে।

তুমি, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না মেঘ আর কুয়াশা ছাড়া।
ট্রেনটা রেললাইনকে রানওয়ে করে উড়ে যাচ্ছে
বাতাসে। আমরা বিশ্বাস করি আমরা মানুষ না, এলিয়েন।
আমাদের অনুভূতির নাম কারবালার স্টেজের অন্ধ, মূক দর্শক।

রাস্তায় পা বাড়ালেই ফিরে আসছ তুমি লাশ হয়ে
পালিয়ে যাচ্ছে খুনি ট্রাক অন্ধকারের ক্ষুধার্ত পেটে।
ফার্মগেটের ভিড়ে তোমার মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়ে
অচেনা ছুরি ডুবে যাচ্ছে তোমারই রক্তের সরোবরে।

মায়ের সাথে হাসপাতালে এসে একটা রঙিন প্রজাপতির ধরতে যেয়ে
শিশুরা না চাইতেই বিবর্ণ স্বর্গ ধরছে মর্গের টেবিলে।
তাদের চোখ বেচে জুয়া খেলছে ডোম তাড়ি আর নারীর
তাড়নাতে। দৃশ্যগুলো ঝাপসা কুয়াশায়
মোমের মতো গলে গলে মিলিয়ে যায়।

ঘুম থেকে উঠে ভাবি, দারুণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম
কারণ এখনও বেঁচে আছি।
আমরা বিশ্বাস করি আমরা মানুষ না, এলিয়েন।
আমাদের অনুভূতির নাম কারবালার স্টেজের অন্ধ, মূক দর্শক।
আমাদের জ্যান্ত শরীরও ঢেকে ফেলে কুয়াশার কাফন।
গণহত্যার উর্বর পলিমাটিতে পতাকা উড়িয়ে নোঙ্গর ফেলে
বাণিজ্যিক কলম্বাস। তাকে অভ্যর্থনা সঙ্গীত শোনায়
শিশুদের অপমৃত্যুর আঁতুড়ঘরের কান্না জমে কঠিন হওয়া
একটা নীল রঙের লোহার বেহালা।

জিন্দা মরহুমের এপিটাফ

মা, জেনো এই এপিটাফ লিখার পরও দিব্যি
বেঁচে আছি আমি। বাজারদরের চেয়ে তরতর করে
বাড়ছে ডেজিগনেশন। মেকাপ ছাড়াই সুন্দর হয়ে যাচ্ছি
দিন দিন। বাইরে প্রবল সুখের বাতাস—
আর ভেতরে বাড়ছে দুরারোগ্য অসুখেরই ঋণ।
যেন অমাবস্যার ঝোপে আমি গরিমাময় নাইটকুইন
সৌন্দর্যের পাপড়ির রঙে লুকিয়ে ঠুকরে খাচ্ছে দাঁতাল
এক মাতাল বুনো শুঁয়োপোকা।

মা, ভয়ানক জীবাণু আমার মগজের স্মোকি ওয়েদারে
জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখোশ পরে আমি
তাদের সাথে মিশি অসীম দূরত্ব মেনে।
ঝড়ো সাগরের তীরে ঢেউ ভাঙে নেচে নেচে—
বৃষ্টি শেষে ভেজা ঘাসে পরিচিত মৃত্যুদূত হেঁটে আসে।

মা, যে তুলতুলে শরীরটাকে তুমি জন্ম দিয়েছিলে আদুরে
রংধনুর হাসপাতালে, সে এখন পৃথিবী সমান বহুতল
এক রং হারানো হাসপাতালে হাঁসফাঁস করে টিকে আছে।
সেই দেহের আশ্রয়ে যেই মনের জন্মদাত্রী আমি নিজে—
শোকাহত এই এলিজি সেই নিঃশব্দ মৃত্যুকে ঘিরে।
নিজের কবর বয়ে বেড়াচ্ছি নিজের কাঁধে, আর জানালা দিয়ে
দূরে তাকালে দেশটাই গণকবর।

মা, আমার একটু সেরে ওঠার দরকার। চুক্তিহীন
দাসখত কিছুতেই দিচ্ছে না মুক্তি—
প্রেমের সেবা নিয়ে সাদা ছড়ি হাতে দিচ্ছি পার

পারাপার বন্ধ হওয়া পাথুরে রাস্তার সীমানা।
চিন্তাভাবনা করে দেখলাম এ যৌথ বাণিজ্যশালায়
দেহ আর মন একসাথে বাঁচে না।

আশাবাদী

নিজের বিকারগ্রস্ত সত্যকে মিথ্যা জানো বলে
তুমিও সূক্ষ্ম আশাবাদী।

শিকারি

এই অভিযোগে দায়ী কেউ না।
তোমার দিকে ধেয়ে আসা
লক্ষ কোটি বাধা রংধনুর বুদ্‌বুদ হয়ে
বাতাসে মিলাবে। প্রবল ঝড়ের স্কুলে
ব্লাকবোর্ডে প্রতিমার মতো মূর্ত হবে নীলাকাশ।
হাত থেকে স্মৃতির ঘড়ি খসে পড়লে
সেখানে এক ফ্যাকাসে শূন্যতার দাগ।
সমুদ্রের নোনা আলোর ভাঁজে
ঘড়িগুলো হাঙর হয়ে সাঁতার কাটে তোমার পাশে।
অবাধ্য হাঙরগুলোকে পোষ মানানো তোমার কাজ।
তুমি এমন শিকারি যে শুধু নিজের দিকেই ছুঁড়তে পারে
তার অভিযোগের ধারালো হাতিয়ার।

হাওয়া, হাওয়া

অন্ধকারে যে থাকে, সে কি করে আলোর সন্ধান দেয় অন্যদের? হয়তো তা সম্ভব হতে পারে শুধু ইগোর প্রদীপ জ্বালিয়ে। কেননা স্যাঁতসেঁতে গভীর অন্ধকারে থাকতে থাকতে তাদের গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধের মতো লেগে থাকে অন্ধকারের লালা। আর সেই লালাকে জ্বালানি তেল হিসাবে ব্যবহার করেই জ্বালানো হয় ঘন, নিকষ আঁধারে ইগোর প্রদীপ। গুহার বাইরে কাঠবিড়ালির রোমশে বাতাস চঞ্চল, পাহাড়ি পথের কিনারে সূর্য ডুবে যেতে যেতে আক্ষেপ করে। সাগরের উষ্ণ জলে পা-ভেজায় না প্রাচীন সে গুহা। শুধু অন্ধকারের পালক দিয়ে ছবি আঁকে নগ্ন শরীরে, যে ছবি আলো জ্বাললেই ‘হাওয়া, হাওয়া’!

রোবট বধের ইতিকথা

মরা নীলতিমির পেটের অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে
আগন্তুক সকালে চোখ কচলে যদি
কোনো এলিয়েন ডাকপিয়ন চিঠির বদলে
এক তোড়া রজনীগন্ধার বার্তা দিয়ে যায় হাতে!

যতবার তোমার আমার বিচ্ছেদ হয় কাঁটাতারের কঙ্কালে
ততবার কাঁটাতার নয়, আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে
অবিচল সিস্টেমের খোলস। আর সেই খোলস ছিঁড়ে
আরো বহুবার ধানের বীজের চেয়েও দ্রুত
সবুজ হয়ে ফোটে তোমার ঘরে ফেরার সম্ভাবনা।

তোমার মুখ মহাকাব্যের সবচেয়ে সুন্দর পঙ্‌ক্তির চেয়েও সুদর্শন।
তোমার মন সাগরের শিয়রে ডুবে যাওয়া হীরকের সূর্যের চেয়ে দ্যুতিময়—
তোমার কণ্ঠ গভীর বনে লুকিয়ে থাকা বৃষ্টির লাজুক পাখা;
শুধু তোমার ইতিহাস বর্তমানের অলিখিত ডাকে
প্যারাসুট থেকে নামে ক্রীতদাসের বেশে।

বর্ডারের এপাশে তোমার দেশ, ওপাশে আমার গাজরের খেত—
এই নো ম্যানস ল্যান্ডে দুইটা দেশের স্বাধীন পতাকার মতো
দুইজন মানুষের শেষ বিদায়ের শোকাহত উল্লাস।
আমার চেতনা আমেরিকান গুপ্তচর সেজে তোমাকে অভিযুক্ত
করেনি কখনো। জানি তুমিও জীবন ভালোবাসো অন্য সবার মতো।
কিন্তু যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার ভান করো
সে ছাঁচে ঢালা মুখোশের আভিজাত্য
তোমাকে আমার কাছে অচেনা পরিচয় দেয়।
সেই সিস্টেমের লোহার বাসর তোমাকে করে এক শিরোনামহীন

কর্পোরেট তালেবান। যার প্রতি বিশ্বস্ত হতে গিয়ে তুমি
বিশ্বাস হারাও পৃথিবীর সহজ, সাধারণ
টাকিটুকি ব্যক্তিক আনন্দগুলোর প্রতি।

যতবার তোমার আমার বিচ্ছেদ হয় কাঁটাতারের কঙ্কালে
ততবার কাঁটাতার নয়, আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে
অবিচল সিস্টেমের খোলস। আর সেই খোলস ছিঁড়ে
আরো বহুবার ধানের বীজের চেয়েও দ্রুত
সবুজ হয়ে ফোটে তোমার ঘরে ফেরার সম্ভাবনা।
রোবট বধ করে মানুষের রূপকথার বিজয়গাঁথা।

অন্ধকারে উধাও ও আমার বোবা গায়ক নদী

অন্তর্গত তৃষ্ণার টানে ছুটে চলা
প্রভু, এ কী শয়তানের লীলাখেলা?
এক পিপাসার শ্রাবণ খুঁজে যেখানে যাই
সেখানে সৃষ্টি হয় আরো গভীর কোনো মরুভূমির তাড়া।

সরিষা ফুলের মতো ঝাঁঝালো রোদ চোখে নিয়ে
চোখ বুজে খুঁজে চলি নদীর যত শত স্মৃতি।
সানগ্লাস ডুবে গেছে যে নদীতে তার পিছে পিছে
আমিও মিছে নদীর গভীরে পালাতে হই নিখোঁজ।

অন্ধকারে উধাও ও আমার বোবা গায়ক নদী,
সমস্ত শরীরে নাচের ঝড় তুলে তুমি
দাঁড়িয়ে আছ মানচিত্রে একই জায়গায়।
আমাদের ছুটে যাওয়া আর তোমার বয়ে চলা
কীভাবে যেন সমার্থকেই মিলে যায়।

জানি এই মিল খোঁজার গরমিলই শাশ্বত শুধু
জোড়াতালির দৈনন্দিন হিসাব ক্রুশে পাওয়া মধু।

অন্তর্গত তৃষ্ণার টানে ছুটে চলা
প্রভু, এ কী শয়তানের লীলাখেলা?
এক পিপাসার শ্রাবণ খুঁজে যেখানে যাই
সেখানে সৃষ্টি হয় আরো গভীর কোনো মরুভূমির ইশারা।

অন্ধকারে উধাও ও আমার বোবা গায়ক নদী,
যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে অনেক রাতে

তারাদের রূপের আয়না হয়ে তুমি তাকিয়ে আছ
ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়ি।
মেরিলিন মনরোর রুপালি গাউন ঢেউ হয়ে
মিলিয়ে যায় বেসুরো পোড়া বাস্তবতায়।

অসীম কাল ধরে অকালপুরুষ চোখ বুজে করে যায় শিকার

অ্যাশট্রের ভেতর ছাই বিছানা থেকে জেগে
দেখি আমার পাশে কুণ্ডলী পাকানো যত ধোঁয়া
দলে দলে উড়ে যাচ্ছে তেপান্তর পেরিয়ে
নিভে যাওয়া আগুনের খোঁজে
জলের ধারে বনস্পতির মতো জ্বলা আগ্নেয়গিরির ভাঁজে।
আগুনের ফুলকি তারার মালা হয়ে ঝরে পড়ছে নিঃশব্দে
সময়ের প্রবাহে। তাদের মতে,
এটা নাকি রডোডেনড্রনের বাগান...

শীতে জড়োসড়ো উন্মুখ মেঠোপথ
ভেবেছিল প্রেম বুঝি সেই উত্তাপের ত্রাণ।
কিন্তু সে-ই হিম বাতাসের পাখা
মেলে রাখে উত্তুরে কাঁটার জানালায়।

ফুটওভার ব্রিজের ওপর পা ছড়িয়ে
এক জন্মান্ধ ঈশ্বর দেখে যায় লাল সবুজ কমলা নীল
আলোর সিগনাল। অথচ কোনো সিগনাল করুণা করে
দেখায় না তাকে অন্ধকারে হারানো বিজলি চেরা পথ...
তাই অসীম কাল ধরে অকালপুরুষ চোখ বুঁজে করে যায় শিকার।

শ্যাওলা সবুজ বনের গভীরে যে ছায়া
মনে চেনায় সূর্যের চলাচল, সে ছায়াগুলো মেঘের মুখে
বিলীন হলে আমি শুধুই স্তব্ধ অস্তাচল।
রাত ও দিনের দূরত্ব ঘোচায় এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক...

কেউ বাড়ায় না হাত কারো নিমগ্ন প্রদীপে—

কিনেছি রঙিন টব, গাছগুলো পোড়ামাটির দেয়ালে
একা একা বড়ো হবে।
মিলনের ঊষর জমিতে
ফোটে ধারালো ক্যাকটাস।
সাগরের অতল ঠিকানা পেলে কে করে
অ্যাকোয়ারিয়ামে মুক্তার চাষ?

সমুদ্রের ফেনা থেকে উঠে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ণবিলাসী প্রজাপতি
একটা মরা জাহাজের মাস্তুল টেনে নিয়ে যায়
বিগত প্রণয়ের দগ্ধ চোরাবালিতে।

পুনর্জন্ম

স্টিল লাইফের কম্পোজিশন থেকে যায় অবিকল—
কিছুদিন পরে ওগুলার মধ্যের আপেলটা শুকায়
ফিকে হয়ে যায় মদের বোতলে পড়া
আলো ছায়ার চলাচল।
ধুলা এসে বলে: সবকিছু শুধু আমার।
আমিও ধুলা হইতে চাই। তার স্বর্গীয় ভিলেন টাইপের
হাসি দিয়ে বলতে চাই "সবকিছু আমার...।"

যখন তোমার অতি সাধারণ মানবিক প্রয়োজনে
কাছে চাই আমাকে
তখন আমি মেঘ হয়ে দিই সাত সমুদ্র পার...
আয়নায় উল্টো লটকায় নিজের কঙ্কাল।

পৃথিবীর যান্ত্রিক দেহ যত সুন্দরভাবে এগিয়ে যায়
অযান্ত্রিক মন তত পিছিয়ে পড়ে অন্ধের ভঙ্গিতে।
মানুষের নিঃসঙ্গতা স্তরে স্তরে পুরু হয়
ভিড়ের প্রলেপে আর প্রলাপে।

শেষ হলেই শুরু হয়, মৃত্যু খোঁড়ে
পুনর্জন্মের ফুলেল সমাধি। গড়ার আগে তাই ভাবি
ভাঙার কারসাজি।

অনেক মানুষের কালো সানগ্লাস পরা শোভাযাত্রায়
নিজেকে পরিচয় দিই 'আমি' বলে।
জানি তুমিও তাই। আমাদের হাত পা মুখ
যখন আর কোনো বিশেষত্ব প্রকাশ করে না

তখন হৃদয়ে কিছু একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ
অন্য মানুষ হয়ে ইশারা দেখায়।
আকাশের কিনার থেকে তারাগুলো জানতে পারে না
সমুদ্রের নিচে ঢাকা আগুনের বিরল ফাগুন।
দূর থেকে পরস্পরের নির্মল মুখ দেখে তবু মুগ্ধ হই।

শিয়াল ও মুরগি

এই সময়ের শিয়ালের অন্তর্লোক স্ক্যান করতে করতে
দেখি শেষ প্রান্তে বসে আছে শুভ্র কাপড় পরিহিত
এক সাধক ঋষি। কিছুটা সে দেখতে সিদ্ধার্থের মতোই—
যেন ধ্যান ছেড়ে উঠে চলে গেছে সুস্বাদু খাবারের খোঁজে
নৈরঞ্জনা নদীর তীরের গ্রামের মেঠোপথে। আর শিয়ালও
শেষ প্রহরে হানা দিয়েছে কবুতরের বাসায় উষ্ণগন্ধ
মাংসের আশায়। অন্যকে বঞ্চিত করা পাপ হলে
নিজেকে অতৃপ্ত রাখাও অন্যায়—ডুবে যাওয়ার আগে
মাথা নেড়ে নেড়ে বলে গেছে বুড়ো সূর্য। যেখানে সে
ডুবে গেছে সেখানে বেঁকে গেছে এক পথ—সারা শরীরে
ফাঁদ পাতা সেই পথের। বকের মতো সরল বিশ্বাসে
বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে তুমি "সরলতা, সরলতা"
বলে চিৎকার করছ আর আমি তোমাকে শিয়ালের
চরিত্রে জীবন যাপনের পরামর্শ দিতে দিতে নিজেই
মুরগির রোস্ট হয়ে পরিবেশিত হয়ে গেছি নৈশভোজে
দৈত্যাকার শকুনদের লালা দিয়ে বানানো প্লেটে।

তারা ভরা দিগন্তের দিকে

“দরজা খোলো, কেউ আছ? আমাকে ধাওয়া
করেছে সশস্ত্র পুলিশের মতো একপাল অন্ধকার।”
না, কোথাও আসলে যাওয়ার ছিল না।
গন্তব্য এই ক্ষণ।
এই মুহূর্তটাকেই হয়তো আমি তাক করে ছিলাম
ভ্যানগগের সূর্যমুখী বাগানের পাশে একটা বাড়ির
জানালা হতে। অবশেষে পৌঁছালাম এই মুহূর্তের কাছে।
আহা, শান্তি! চোখ নিমীলিত হয়ে আসে।
যা কিছু পাইনি তার দিকে গন্তব্য নির্ণয় না করে
চলো হেঁটে যাই যা পেয়েছি তার কাছে।
দুই পায়ে ভর করে বসে থাকা বিড়ালের মতো
বসে থাকি চোখ বুঁজে। পাশেই যে রক্তখেত—
কত দুঃসংবাদের আনাগোনা সেই খেতে।
কিন্তু আমি কান পেতে অনেক বোমা ফাটার শব্দের মধ্যে
পাখির ডিম ফেটে একটা শাবকের কিচিরমিচির
শব্দ শুনতে পাচ্ছি আর তোমাকে আহ্বান করছি প্রেমে।
জগতের জরা ব্যাধি শোকতাপ উপশম করতে
কেউ তো গৌতম বুদ্ধ হলো স্বেচ্ছায়।
আর আমরা হব প্রেম বুদ্ধ। প্রেমে লাভ করব নির্বাণ,
প্রেমই অনির্বাণ হয়ে জ্বলতে থাকবে ঘরে...
প্রেমকে ছাতা করে কুৎসিত দৃশ্যের সাঁকো পার হয়ে
চলে যাব তারা ভরা দিগন্তের দিকে চিরতরে।

অচল নাট্যশালা

হঠাৎ নাক উঁচু শহরে
ভিড়ের ভেতর পিছু ফিরে দেখি
আমার ছায়ার স্থান দখল করে আছে এক
উটকো সমুদ্র।

তুমিও একটা মানবীয় সমুদ্র
উপকূলে তারাদের আলো নিভিয়ে
অন্ধকারের শিখা জ্বালো
চেতনার শিয়রে।

আমরা তার তীরে জন্ম নিয়ে
মরে যাবার পরও
সে থামাবে না ঢেউয়ের নৃত্য।
তোমার চোখ সেই সমুদ্রের অনুকরণে
বিরতিহীন ঝরনার ছদ্মবেশ
ধারণ করে।

ভাঁড়ের মঞ্চে
জীবন তোমার দিকে
ছুড়ে দেয় থ্রেট।
তোমাকে ছাড়া যে
অচল নাট্যশালা...

যে চোরাবালির অতলে
ফুটে ওঠে সূর্যমুখীর আগামী বাগান।
তার পিছুটান ছিঁড়ে

হৃদয় ডুবে যাওয়া ডুবোজাহাজের
কঙ্কাল হয়ে ভেসে থাকে
সদ্য অতিক্রান্ত বন্দরে
মায়ার ধু-ধু চরে।

প্রতিটা সর্বস্বান্ত ঝড়
আমাদের হারিয়ে যাওয়া
রেলগাড়ির বিপন্ন পথে
আলেয়ার আলো জ্বালা।

ভাঁড়ের মঞ্চে
জীবন তোমার দিকে
ছুড়ে দেয় থ্রেট।
তোমাকে ছাড়া যে
অচল নাট্যশালা...
তোমাকে ছাড়া অচল
সূর্যের জরুরি কারখানা...

অন্যরূপে

আরো ছায়া, আরো অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দাও বনানী!
পেছনে ছুটে আসে আপন উপহাসের কাহিনি।
গভীর আড়াল দিয়ে ঢাকো সমাধি,
নয়তো তোমার নাম বৃথাই নিষ্প্রাণ দেয়াল।

আজ যা মুখ ফুটে বলোনি মহাকাল
কাল তা বলা কি হবে অতীবই সহজ?
এই ব্যর্থতা জয়ের পায়রা হয়ে দেখায় পথ...
আমরা সবাই খুব সংখ্যালঘু সাধারণ।

আকাশ ছুঁতে পারে না বলে মানুষ
মাটির চেয়ে আকাশ বেশি ভালোবাসে...

সেতু ভাঙার পর জেগে থাকে জলের সহানুভূতি...

কিছু পাখি অন্ধকার দিয়ে জ্বালায় বজ্রের আগুন
দিনের আলোর সান্ত্বনা তার চোখের স্তূপে বয়ে আনে
জন্মান্ধের ধারণা। ভুল আকাশে তোমারেই করিয়াছি ধ্রুবতারা
তেলে, জলে কখনো একত্রে মেলে না...

জানিয়াছি তেল আর জল অন্যরূপে যে যার
কেমিক্যাল সতীত্ব আর অসীম একাকিত্ব নিয়েও
মিলতে পারে একই বেভারেজের দোকানে পাশাপাশি
কোমল, উষ্ণ পানীয়'র এয়ারটাইট ক্যানে।

মানবজন্ম

ধুর, এইসব মানবিক বাল ছাল
দায়িত্বজ্ঞান, আই হেট জ্ঞান,
আর অসুখী অতৃপ্ত আত্মা ফালায়া
দূরের কোনো রোদে হেঁটে যেতে ইচ্ছা করে।
বালের সানগ্লাস
বালের সানসক্রিম
থু থু থু...
আই হেট মানুষ জন্তু
আর পুতুপুতু মানবিকতা।
লালন সাঁই বসে বসে তামুকে টান দিয়ে
মানবজন্ম পাওয়ার সাধনা করুক।
আমার মানবজন্ম আমি তারে
বিনামূল্যে দিয়ে
মানবকূল হতে ১০০০০০০০০০০০০০০
০০০০০০০০০০০০০
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ হাত
দূরে সরার সাধনা করব।

আরবান সেক্সুয়াল ক্রাইসিস বা এন্টারটেইনমেন্ট

নরকে বাস করার যত হ্যাপা আছে সবই
শিয়রে বরফের সূর্যের শিখায় গলে যায়
শিব-পার্বতীর চিতার ফুলেল আগুনে।

আমি তোমাকে চিনি না
তুমি বলবে তুমিও নিজের কাছে অচেনা
কেউ কাউকে চেনে না
মানুষে জমজমাট এ নির্জন অরণ্যে।

কমিউনিকেশন বিজ্ঞানী আরো বেশি করে
টাওয়ার বসায় তোমার বেডরুমে,
কিচেনে, বারান্দায়।
মানুষের ভালোবাসা সে টাওয়ার ছেড়ে
একটা সাদা সারস হয়ে
বিস্মৃতির আকাশের ঠিকানায় উড়ে যায়।
কাছে থাকুন বলে বলে নগরী
দূরে সরার হাতছানি দেখায়।

ঈশ্বরের ফার্মেসিতে কনডম পাপেটের প্রেম হয়।
আদম, হাওয়া যুগের ধাওয়া খেয়ে
লুকিয়ে লুকিয়ে কামনার জাল বোনে
রমনা পার্কে, শপিং মলে, আল্পনা আঁকা হুড তোলা রিক্সায়।
গ্রাম থেকে আসা ফেরারি শ্রমিক
পোস্টারে পূর্ণিমার গায়ে মুততে মুততে বিভোরে তন্ময়।

তোমার কাছে থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে সরে যাই

তারা খসা হয়ে ফিরে আসি তোমার গভীর সমুদ্রে
ফ্রয়েডের মৃত কঙ্কালের ইশারায়।
ইশারা না বুঝে, বুঝেও না বুঝে
সম্পর্কের পিয়ানো বাজানো একগুঁয়ে আঙুলে
কোনো একটা প্রেমিক বিয়োগের ট্রাজেডিতে
নকল দাঁতের মতো একটা জ্যান্ত রিড খসে পড়ে।

প্লেটোনিক প্রেম

এই মুহূর্তে যুদ্ধধাঁধালো জমপেশ আকাশ থেকে
আমি তাকিয়ে আছি এই আকাশের বাইরে
বেলুনের মতো গোলাপি চকচকে আকাশের দিকে।

বহু আলোকবর্ষ দূরে অচেনা এলিয়েন!
তোমার কথা ভেবে আমার মানবিক হাতগুলো
ডানা হয়ে যায় খুব ভোরে,
ইন্দ্রিয়বিহীন জানালা দিয়ে বিরহ ওড়ে।
প্রেমের স্পর্শকাতরতায় অকাতরে যার হাত ধরি
সে হয় প্রতিবেশী ভিলেন।

আমাদের সুরগুলো মিলে মিলে কথা হয়ে যায়
সেই কথাগুলো সাদা ফেনার রঙে জাগে
সমুদ্রের বন্য বন্য হাওয়ায়।
যে কথা উঠে আসে আজ তোমার মনে
সেই কথার রূপকথায় সব জীবন মিলে যায়...

এই মুহূর্তে আমার বিবর্ণ বেঁচে থাকা
যেন এক ক্ষতবিক্ষত পোস্টার
শুয়োরের দাঁতের মতো হলুদ দেয়ালে।
জনাকীর্ণ এ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের শিয়রে
নিজেকে বিপণনের যুদ্ধে বিপন্ন আমার শীতল চামড়ায়
জলপাই তেলের মতো স্বচ্ছ টলটলে
এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে।
তোমার ফুল বাগানে সে সমগ্র বসন্ত নিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়া রক্তিমাভা শিশিরের জাল।

সাইবার ওয়েভলেন্থে ভেসে ভেসে নিউরন মেটায়
নিউরনের কামনা বাসনা;
দুইটা মস্তিষ্ক গবেষণাগারের ভাগাড়ে
প্রেম করে আর শরীর মস্তিষ্ক ছেড়ে
ছেঁড়া ঘুড়ির মতো মহাশূন্যের অথই নীল পাকে
ঘুরপাক খেতে খেতে শরীরের ঠিকানায় বেরিয়ে পড়ে।

শিউলি ফুলের গন্ধ

এই চলন্ত সসারের মতো সময়ের চুপিসারে কতজন যে কতজনের খাদ্য হয়ে যায় নীরবে! খাদকও খাদ্য হয় পৃষ্ঠার অপর পিঠে। আমি এই খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের বাইরে গিয়ে বসে আছি বরশি পেতে, যে বরশিতে নেই টোপ, নেই মৎস্য শিকারির লোভ। তারা খসে পড়ে। মেঘগুলো একে অপরের হাত ধরে ধরে চলে যায় তেপান্তরে। এই থমকে যাওয়া সময়, যাকে ধরতে গেলেই ছুটন্ত ট্রেনের মতো দৌড় দেয়। আর পাত্তা না দিলে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকে দরজার সামনে মাছের কাঁটা প্রত্যাশী বিড়ালের মতো। আমি সেই সময়ের সহযাত্রী হয়ে বসে আছি, ঘামছি আর অপেক্ষা করছি তোমার প্রত্যাবর্তনের। রাস্তায় বাসি রক্ত, ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। ঘরে গন্ধ মাংস পোড়ার। আমি এইসব গন্ধ এড়িয়ে চলে যাই মহাকাশের উঠোনের এক কোণে। যেখানে ছায়াময় ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল শিউলি গাছ, সারাবছর টুপটুপ করে তার ফুল ঝরে। আমি বুক ভরে শিউলি ফুলের গন্ধ নিতে চাই।

চলো এগিয়ে যাই

থেমে থাকা বগিটাকে ধাক্কা দিচ্ছে পেছনের ট্রেন
চলো এগিয়ে যাই
জুঁইফুলের মতো সাদা বৃষ্টি পড়ছে প্রচণ্ড গতিতে
রাস্তাঘাটে ভীষণ জ্যাম লেগে গেছে
জ্যাম লেগে গেছে অনাহত মস্তিষ্কে
চলো ঠেলেঠুলে, চিপা দিয়ে বা ডিঙ্গিয়ে কিংবা উড়ে
যেভাবে পারি এগিয়ে যাই।
কারণ এগিয়ে যাওয়াতেই আনন্দ, নিজেকে
পুনর্জন্ম দেয়াতেই সুখ। অসংখ্য সূর্যমুখীর নির্যাস
দিয়ে বানানো তোমার কক্ষপথ। তুমি চলো।
তোমাকে সাথে নিয়ে তুমি চলো নীল মহাকাশে
পরিকল্পনার জল্পনা কল্পনা তুলে রেখে...
মানুষ তো শৈশবেরই চাষ করে শুধু
বৃদ্ধ দেহের কোটরে উঁকি মারে একটা শিশু
পাখির বাসায় যেমন উৎসাহী ছানা।
চলো উড়ে যাই অন্য আকাশে, অন্য গ্রহের
সুরেলা নরম ঘাসে। পিছুটান পিছু ফেলে
রেখে চলো এগিয়ে যাই।
হাসিমুখে আমার শিয়রে
মানুষ কত দূরে দূরে চলে যায়!
যেন শীতের সকালে রাস্তার পাশে রোদ পোহানো
কুকুর মাতার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া গোল্লু
বাচ্চাদের মতন, পিঠের এপাশ আর ওপাশ।
এই তো পৃথিবী! পিঠের এপাশ আর ওপাশ—
পাশ ফিরলেই তোমার দেখা, ছায়া নদী
একটা মাত্র চাঁদ, সে-ই পারাপার দুইটা ভিন্ন আকাশের।

মানুষ তো বৃক্ষের মতো মাটির সাথে সম্পর্ক
পাতানোর কথা ভেবে শেষমেষ হয়তো হয়ে যায়
পুবালি বাতাস। উড়ে যায় বৃষ্টি, পাহাড়ের মাথায়
মেঘবালিকার দল। আর আমি সেই বাতাসের গায়ে
শেকড় ছড়াতে ছড়াতে ভাবি, পরিপূর্ণ বৃক্ষ হতে
আর কত বাকি? মানুষ কত দূরে দূরে চলে যায়!
আমি দূরত্বের চোখে আয়না বেঁধে দিয়ে দেখি
অসীম আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়ে তুমি বসে আছ
হাসিমুখে আমার শিয়রে।

শেষ থেকেই শুরু করি

এই জ্বরে ধরা পোড়ো বালিশ কাঁথার নিচে
কোথাও একটা জাদুর বাঁশি লুকানো আছে—
আমি নিশ্চিত। এমতো বিশ্বাসে
জাহাজ ডুবে গেলেও উদ্ধার নিজের প্রয়াসে।
দূরে কোনো অচিন গাঁয়ে গোরু নিয়ে ফেরে
গায়ক রাখাল। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি ওড়ে
শর্ষে ফুলের মাঠে। কংক্রিটের কফিনে বন্দি
আমি সেই গ্রামের চেনা গন্ধটা শুঁকি।

সবকিছু জানিয়ে দিয়ে সময়—অজানা সেজে আসে
রোজ তোমার অধীর জানালায়।
হাড়হাভাতের কান্না শুকায় রাতের সমুদ্র ঘুমে।
মিলনের অঙ্ক মেলাতে ব্যর্থ চাঁদ
গরমিলে পায় উত্তরের জিয়নকাঠি।
আমি ফিরি ফের, তুমিও ফেরো মেঘে মেঘে
অতিথি পাখিদের দেখে
ফেরার অধিকারে।

আরো বহুবার, যতবার খুশি
চলো শেষ থেকেই শুরু করি।

আজকাল যা কিছু মিস করি অথবা পারফেকশনিস্ট মানব ওরফে রোবট সম্প্রদায়

আজকাল যা কিছু মিস করি আমি, তার নাম বোকামি। বোকামি সুন্দর কারণ তার মধ্যে একটা সরলতা আছে। বোকামির মধ্যের সরলতাকে মিস করি আমি। আজকাল মানুষ অনেক চালাক, রূপকথার শিয়ালের মতোই। আজকাল কাউকে আর তেমন বোকামি করতে দেখি না, এমনকি শিশুদেরকেও না। সবাই সব জানে, বোঝে। না জানা, বোঝার সেই বিস্ময়কে মিস করি আমি।

পৃথিবীটা ছোটো হতে হতে হয়ে গেছে একটা মার্বেল আর মানুষের মস্তিষ্ক বড়ো হতে হতে হয়ে গেছে তিমি মাছের সমান। একটা পাতায় শিশিরে গোসল করতে উড়ে এলো একদল ফড়িং। সূর্যের সুইচ অফ হতেই গান গেয়ে উঠল ঝিঁঝিদের ক্লাসরুম। জোনাকির আলোয় রাতভর হবে পড়াশোনা। ভুল না করতে করতে, বোকামি না করতে করতে মানুষগুলো এখন রোবট ছানা। তারা আর চাইলেও মিষ্টি একটা বোকামি করতে পারে না...

যাব সাধুর চরণ খুঁজে

এমন বৈরাগ্য নীল রাতে সাধুর চরণের কথা মনে পড়ে। সবকিছু হারিয়ে কাঁদতে আর কোথায় বা যেতে পারি সাধুসঙ্গ ছাড়া। হাতে হাতে ফেরা অগ্নিকুণ্ড দেবে পাহারা। যেন চোখ থেকে এক ফোঁটা জল না ঝরে। অশ্রু যে অমূল্য। তাদেরকে জমিয়ে রাখতে হয়, যেভাবে কৃপণ সঞ্চয় করে রাখে চার আনা, আট আনা। আমার ষোলো আনাই বিসর্জন যেতে বসেছে মানুষকে বিশ্বাস করে করে। বিশ্বাস ফিরে পেতে যেতে হবে আলোর শহরে না, অন্ধকারের বসত বাড়িতে। যেখানে গোল হয়ে বসে গান, তত্ত্ব আলোচনা আর ব্রহ্মাণ্ডকে একটা শিশুর মতো কোলের মধ্যে পাওয়া। যাব সেই অচিনপুর, জোনাকিপুর। গোল হয়ে বসব যেভাবে সূর্যকে ঘিরে বসে গ্রহ, নক্ষত্রমালা। সাধুকে বলব: আমার ভজন সাধন কিছুই হলো না এই পোড়ো সময়ের ঘূর্ণিপাকে। এবার যেন সে চরণে একটু আশ্রয় দেয় আর আমি যুদ্ধের ইতিহাস থেকে বের হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি শান্তির ভূগোলে।

মুমূর্ষুর রাষ্ট্রে

['৩০ বছর বয়স অবধি ভাবতাম যে আমার মৃত্যু নেই... আমি অবিনশ্বর। কিন্তু যদিও মৃত্যু নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না, তবু এখন বেশ ভালো করে বুঝছি যে, আমার অস্তিত্ব নিদারুণভাবেই ক্ষণস্থায়ী... অর্থাৎ আমি মরণশীল।' # জাঁ পল সার্ত্রে]

পৃথিবীর দুঃসহ দীর্ঘ রাতে
কালো বরফের জোছনায়
শিয়রে মৃত্যুর ঢেউ এসে ভিজিয়ে দ্যায়।
এমন রাতে নেকড়ে বের হয়।
দূরে কোনো জমে যাওয়া বনে
অচেনা জন্তুর ডাক শোনা যায়।

ফিসফিস:
রয়েছি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি...
আজকের তাজা খবর
হবে অতীত কাহিনি।

নীলগিরি পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন
ভেতরে নুড়ি ভাসিয়ে নিচ্ছে অভিলাষের শ্রাবণ।
করতলে রেখাগুলো কেটে নিয়েছে কেউ
মানচিত্রের নদীতে চলে দূষিত রক্তের অনাবিল ঢেউ

ফিসফিস:
রয়েছি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি...
আজকের তাজা খবর
হবে অতীত কাহিনি।

প্রপাতের জিভ যেন ব্যক্তিগত সময়
যত মৃত্যু মৃত্যু প্রেম, জিভটা বড়ো হয়।
ভূমি ছুঁলেই হবে ক্ষয়...
আমি হব তোমার প্রয়াত দুর্দান্ত প্রণয়।

ফিসফিস:
রয়েছি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি...
আজকের তাজা খবর
হবে অতীত কাহিনি।

তোমার সময় আমার সময় তার সময় তাদের সময়
আমাদের অথই সময়ের হিসাব চাপা পড়ে রয়
শিলা হয়ে যাওয়া পালকের তলে।
ফুল হতে গিয়ে ভুলের ফানুস উড়ে যাই
পরিবেষ্টিত রাজনীতির কুহকে।